

নারী ও কিশোরীদের মাসিক স্বাস্থ্যবিধি

নাসরীন জাহান লিপি

মাসিক একটি স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার অনেক সমাজের মতো বাংলাদেশেও মাসিক এখনো লজ্জা, ভ্রান্ত ধারণা ও নীরবতার আবরণে আবদ্ধ। এই নীরবতা শুধু সামাজিক মনোভাবের কারণে নয়; এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে অজ্ঞতা, দারিদ্র্য, পর্যাপ্ত স্যানিটেশন সুবিধার অভাব এবং মাসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক শিক্ষা না থাকা। ফলে দেশের নারী ও কিশোরীদের একটি বড়ো অংশ আজও বৈজ্ঞানিকভাবে, নিরাপদ উপায়ে মাসিক সামলাতে পারে না। একজন কিশোরীর প্রথম মাসিকের অভিজ্ঞতা যতটা স্বাভাবিক হওয়ার কথা, বাস্তবে তা অনেক সময় ভয়, লজ্জা ও বিভ্রান্তির মিশ্র অভিজ্ঞতায় পরিণত হয়। ফলস্বরূপ, মেয়েরা নিজের শরীরকে অবহেলা করতে শেখে, স্বাভাবিক জৈবিক প্রক্রিয়াকেও লুকানোর বিষয় হিসেবে দেখে। এতে তাদের স্বাভাবিক আত্মবিশ্বাস কমে যায়, নিজের স্বাস্থ্য নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা সীমিত হয়।

অথচ মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা বা মেন্সট্রুয়াল হাইজিন ম্যানেজমেন্ট কেবল একজন নারী বা এক কিশোরীর ব্যক্তিগত গল্প হতে পারে না। মাইক্রো লেভেলে একজন নারী বা এক কিশোরীর স্বাস্থ্য সচেতনতা রাষ্ট্রের জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার প্রকৃত চিত্রকে তুলে ধরতে পারে। একটি দেশের নারী ও কিশোরীর মৌলিক অধিকার কতটা সংরক্ষিত, নারী ও কিশোরী কতটা মর্যাদাবান জীবনের অধিকারী হচ্ছে, সে বিষয়েও আলোকপাত করা যায়। এই প্রেক্ষাপটে এভাবে বলাটা অসত্য হয় না যে, যদিও দেশ অর্থনৈতিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, তবুও বিশেষ করে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর নারী ও কিশোরীদের জন্য নিরাপদ, সশ্রমী এবং পরিবেশবান্ধব মাসিক স্বাস্থ্য পণ্য এবং সেবা নিশ্চিত করা এখনও একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। বিভিন্ন গবেষণা ও জাতীয় জরিপ এই সমস্যাগুলোর মূল কারণগুলো চিহ্নিত করেছে, যেমন সচেতনতার অভাব ও কুসংস্কার, অর্থনৈতিক বাধা ও সশ্রমী পণ্যের অভাব, অপরিপাক্য অবকাঠামো ও স্যানিটেশন সুবিধা ইত্যাদি।

ইউনিসেফ এবং অন্যান্য সংস্থার গবেষণা অনুযায়ী, দেশের স্কুলগামী কন্যাশিশুদের প্রায় অর্ধেকই প্রথম মাসিকের আগে এ বিষয়ে কোনো তথ্য পায় না। ইউনিসেফের তথ্যমতে, প্রায় অর্ধেক স্কুলগামী কন্যাশিশু তাদের প্রথম মাসিকের আগে এ বিষয়ে কিছু শোনেনি। দেশের ৬৪ শতাংশ কিশোরী বয়ঃসন্ধিকালের আগে মাসিক সম্পর্কে জানে না, যার ফলে তারা প্রথম মাসিকের সময় অপ্রস্তুত ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। পারিবারিক ও সামাজিক সংস্কারের কারণে মাসিক নিয়ে খোলাখুলি আলোচনার অভাব রয়েছে। সামাজিক নীরবতা, কুসংস্কার আর ভুল তথ্যের ফাঁদে পড়ে নারী ও কিশোরীর স্বাভাবিক বা প্রাকৃতিক এক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা এই একুশ শতকে এসেও একটি ট্যাবু বা নিষিদ্ধ বিষয় হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, নারী ও কিশোরীর জন্য মানসিক চাপ ও উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পণ্য কেনার সময় পুরুষ বিক্রেতাদের সাথে কথা বলার অস্বস্তিও একটি সামাজিক চ্যালেঞ্জ, যা তাদের জন্য এই সাধারণ কাজটিও লজ্জাজনক ও ভীতিকর করে তোলে। এই ট্যাবু মেয়েদের চলাচলের স্বাধীনতা সীমিত করে ফেলে এবং তাদের আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দেয়।

অর্থনৈতিক বাধা এবং সশ্রমী পণ্যের অভাবও নারী ও কিশোরীর মাসিক স্বাস্থ্যবিধির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অন্তরায়। ওয়াটারএইড বাংলাদেশের একটি গবেষণায় জানা যায়, স্যানিটারি প্যাডের উচ্চমূল্যের কারণে এটি অনেকের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। অনেকে স্যানিটারি প্যাড ব্যবহাও স্বচ্ছন্দ্য বোধ করলেও উচ্চ খরচের কারণে মাসিকের সময় কাপড় ব্যবহার করতে বাধ্য হন। অনেক দরিদ্র নারী বাড়ির বাইরে যেতে হলে স্যানিটারি প্যাড ব্যবহারের সামর্থ্য রাখলেও, ঘরে থাকার সময় সশ্রমের জন্য পুরোনো বা অস্বাস্থ্যকর কাপড় ব্যবহার করেন। গার্মেন্টস এর নারী কর্মীরা দীর্ঘ শিফটে কাজ করেন, কিন্তু স্বল্প বেতনে প্রতি মাসে প্যাড কিনে ব্যবহার করা তাদের জন্য কঠিন। ফলস্বরূপ সাদা -রাব, চুলকানি, এমনকি প্রজননক্ষমতার ক্ষতিও হতে পারে।

মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার পথে একটি বড়ো বাধা হলো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে যথাযথ স্যানিটেশন অবকাঠামোর অভাব। দেশের বেশির ভাগ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঋতুকালীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনাবান্ধব টয়লেট নেই। সেখানে জরুরি স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারের সুযোগ থাকে না এবং ব্যবহৃত ন্যাপকিন ফেলার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থা নেই। জাতীয়ভাবে পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা গেছে, যেখানে প্রতি ৫০ জন শিক্ষার্থীর বিপরীতে ১টি করে টয়লেট থাকার কথা, সেখানে আছে ১৮৭ জনের জন্য ১টি। অনেক স্কুলে মেয়েদের জন্য পৃথক এবং ব্যবহারের উপযোগী টয়লেট না থাকায় প্রায় ৩০ শতাংশ ছাত্রীকে প্রতি মাসে ঋতুকালে স্কুলে অনুপস্থিত থাকতে হয়। ফলে তারা একদিকে ক্লাসে পিছিয়ে পড়ে, অন্যদিকে পরীক্ষার ফলাফলও খারাপ হয়, যা তাদের শিক্ষা জীবনকে ব্যাহত করে।

সরকারি অফিস ও কর্মক্ষেত্রগুলোতেও নারীর জন্য ঋতুকালীন বিশ্রামের জায়গা এবং ডঅবঐ (ডঃবং, ঋতুহঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃ, ধঃফ ঐঃমঃবঃবঃ) সুবিধাগুলোর সঠিক রক্ষণাবেক্ষণ, সাবান এবং ডাস্টবিনের অভাব পরিলক্ষিত হয়। এসবের ফলাফল হিসেবে নারী ও কিশোরীদের জীবনে বহুমুখী নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে, যা তাদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সামগ্রিক সামাজিক অবস্থানের ওপর প্রভাব ফেলছে। দেশের অর্ধেক জনসংখ্যা যদি স্বাস্থ্য ঝুঁকি, শিক্ষার ক্ষতি, সামাজিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত থাকে, তাহলে তা কোনো দেশের জন্য উপকার বয়ে আনে না। অস্বাস্থ্যকর পুরোনো কাপড় ব্যবহারের ফলে নারী ও কিশোরীরা গুরুতর স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে ভুগছে। স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞদের মতে, ছয় ঘণ্টা অন্তর ন্যাপকিন না পাল্টালে ব্যাকটেরিয়ার সংক্রমণের ঝুঁকি থাকে, যা থেকে নানা রোগ দেখা দিতে পারে। অস্বাস্থ্যকর ব্যবস্থাপনার কারণে নারীরা ভুগছে প্রজনন ও মূত্রনালি সংক্রমণ সংশ্লিষ্ট মারাত্মক স্বাস্থ্য সমস্যায়। এমনকি, মাসিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার সঠিক পরিবেশ না থাকায় প্রতিদিন গড়ে ১৮ জন নারী জরায়ু ক্যানসারে মারা যাচ্ছে বলেও তথ্য পাওয়া যায়। ওদিকে স্যানিটারি প্যাডের ব্যাপক ব্যবহার এবং অপর্যাপ্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির কারণে পরিবেশগত উদ্বেগ সৃষ্টি হচ্ছে। ব্যবহৃত প্যাড ফেলার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত ডাস্টবিনের অভাব পরিবেশের ক্ষতি ও স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করছে।

মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকার, বেসরকারি সংস্থা (এনজিও), বেসরকারি খাত এবং স্থানীয় কমিউনিটির সমন্বিত প্রচেষ্টাতে অবশ্যই প্রয়োজন। তবে সবার আগে দরকার পরিবারের সহায়তা। বিশেষ করে মায়ের দায়িত্ব হচ্ছে কিশোর মেয়েকে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে জানানো। একই সঙ্গে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে এ ব্যাপারে সচেতন ও সংবেদনশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে মাসিক স্বাস্থ্য শিক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার, যা ছেলে-মেয়ে সবার জন্যই প্রয়োজন। পরিবারগুলোতে খোলামেলা আলোচনার পরিবেশ তৈরি করা এবং সমাজ-ভিত্তিক প্রোগ্রামে পুরুষদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে এ সংক্রান্ত আলোচনায় বিজ্ঞানসম্মত তথ্যের উপস্থাপন ঘটানোর মাধ্যমে মাসিক সংক্রান্ত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করা জরুরি। এভাবেই মাসিক নিয়ে যেসব কুসংস্কার আছে, সেগুলো দূর করে সবার মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ নিতে হবে।

রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারকদের স্যানিটারি পণ্যের দাম কমাতে ভর্তুকি বৃদ্ধি করা এবং বিকল্প পরিবেশবান্ধব পুনঃব্যবহারযোগ্য পণ্যের প্রসারের জন্য প্রচারণা চালানোর কাজ গুরুত্বের সাথে এগিয়ে নিতে হবে। কাঁচামালের ওপর কর ছাড়ের সুবিধা যেন ভোক্তার কাছে পৌঁছায়, তা নিশ্চিত করার জন্য স্পষ্ট আইনের প্রয়োজন। গ্রামীণ নারীদের স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারে উৎসাহিত করতে হবে। স্বল্পমূল্যে কীভাবে দরিদ্র নারীদের জন্য ন্যাপকিন সহজলভ্য করা যায়, তা বিবেচনায় নিতে হবে। অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই সরকারি নির্দেশনায় মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে মেয়েদের জন্য উন্নত, আলাদা টয়লেট বসানো বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, যেখানে ময়লা ফেলার বুড়ি, সাবান ও পানির ব্যবস্থা থাকবে। এছাড়াও, নারী শিক্ষকদেরকে মেয়ে শিক্ষার্থীদের সাথে মাসিক নিয়ে কথা বলতে এবং যথাযথ স্যানিটারি ন্যাপকিন যেন পাওয়া যায়, তা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে।

বাংলাদেশে মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা একটি বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ হলেও গত এক দশকে জনগণের মাঝে মাসিক স্বাস্থ্য সচেতনতা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। স্কুলভিত্তিক স্বাস্থ্য শিক্ষা বাড়ানো হয়েছে। বহু এনজিও অল্প খরচে প্যাড তৈরি ও বিতরণ করছে। স্থানীয়ভাবে “রিয়েজবল ক্লথ প্যাড” তৈরি হচ্ছে, যা ধুয়ে বারবার ব্যবহার করা যায়। মিডিয়া ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সচেতনতা প্রচার বেড়েছে। সরকার স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য উদ্যোগে মাসিক স্বাস্থ্যকে অন্তর্ভুক্ত করছে। নতুন প্রজন্মের মায়েরা এখন অনেক বেশি সচেতন। মেয়েরা ১০-১২ বছর বয়সেই মাসিক সম্পর্কে জেনে যাচ্ছে, যা আগের প্রজন্মে ছিল না। ডিজিটাল মিডিয়া থেকেও তথ্য মিলছে। তবে ভুল তথ্য যেন মাসিক স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনাকে আরও চ্যালেঞ্জের ভেতর ফেলে না দেয়, সে ব্যাপারে সচেতনভাবে ব্যাপক প্রচারণার প্রয়োজন আছে।

মাসিক বা ঋতুস্রাবের সময় কিশোরীদের পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর ও সুস্বাদু খাবার গ্রহণ করতে হবে। পরিমাণ মতো পানি (দিনে অন্তত ৮ গ্লাস) পান করতে হবে। এ কথা অনস্বীকার্য, যে সমাজ নারীকে সম্মান করে, সেখানে তার শারীরিক প্রয়োজনকেও মর্যাদা দেওয়া হয়। মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা মূলত নারীর সামগ্রিক ক্ষমতায়ন, যেখানে নারীর আছে নিজের শরীর নিয়ে কথা বলার অধিকার, মাসিকের সময় কর্মস্থলে সহযোগিতার পরিবেশ এবং স্বাস্থ্যবিধি মেনে নিজের সিদ্ধান্ত নেওয়ার স্বাধীনতা। মাসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা একটি দেশের উন্নয়ন পরিমাপের সূচক। বাংলাদেশের নারীরা বহু বাধা পেরিয়ে আজ শিক্ষা, কর্মক্ষেত্র, নেতৃত্ব প্রদান তথা সবখানে এগিয়ে যাচ্ছে। মাসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে অবহেলা না থাকলে তাদের এই অগ্রগতি আরও ত্বরান্বিত হবে। তখন জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের নারীর অবদানের পরিমাণও হবে অনেক বেশি।

আমরা চাই, বৈষম্যমুক্ত বাংলাদেশ একটি সভ্য দেশে পরিণত হোক। আর কে না জানে, একটি সমাজ তখনই সভ্য হয়, যখন তারা নারীর শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দেয়। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল হবে তখনই, যখন প্রতিটি কিশোরী ও নারী তাদের মাসিককে নিরাপদ, স্বাভাবিক ও মর্যাদাপূর্ণভাবে পরিচালনা করতে পারবে। আশা করি সে-ই বাংলাদেশ আমরা অর্জন করতে পারব।

#

লেখক: উপ প্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদফতর

পিআইডি ফিচার